জানি না কে সেই জীব যার পরনে আমাদের মতোই জুতো, যেমন জানি না কী করছিল সে প্রথমে গণ্ডোয়ানা এবং পরবর্তীকালে আমেরিকার অগভীর সমুদ্রের পাশের গহিন জঙ্গলে। শুধু জানি, এই পৃথিবীর প্রথম সভ্য প্রতিনিধি আমরা নই আর।'

'উদ্ধার করতে হবে জিনিসটা, নিজেদের দপ্তর আর সরকারকে লুকিয়ে। কী করে করবে ভেবেছ?'

'কিছু বলিপ্রদত্ত জীব দরকার। তোমার নীচে তো একজন কাজ করে, তাই না? ভারতীয়... দরকার পড়লে যার মুখে কুলুপ পড়িয়ে দেওয়া যায়?'

ফোন রেখে ফাটার বুঝলেন তার বিরক্তি একেবারে গায়েব। বাইরের কিউবিকলে বসে থাকা সেক্রেটারি শুনতে পেল ডিরেক্টর আনন্দে শিস দিচ্ছেন।

অপ্রাগৈতিহাসিক

প্রথম পর্ব: ঈশ্বরের বাগান

সোহম গুহ

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

"Soham's words cut deep like a glass-shard and his worlds feel real and lived-in. There is kindness in these pages, but there's also cruelty. There is warmth but there's also horror. I love it."

—Amal Singh
Author of 'The Garden of Delights'

"এক আশ্চর্য অনাদি-অনন্ত স্থানকালবৃত্তের কাহিনি যা সময়ের রৈখিকতার ধারণাকে আমূল বদলে দিয়ে যায়।"

—দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
সাহিত্যিক

"১৯৪০ এর দশকে মার্কিন লেখক রবার্ট হেইনলিন প্রথম জন্ম দেন 'স্পেকুলেটিভ ফিকশন' শব্দবন্ধের। এই জঁর নিয়ে আজকের পাঠকবিশ্ব উত্তাল। এখনকার আতশকাচে, ১৯৪৯ সালে লিখিত জর্জ অরওয়েলের '১৯৮৪' থেকে শুরু করে আশির দশকে মার্গারেট অ্যাটউডের 'হ্যান্ড মেইডস টেল', এমনকী প্রাচীন নানা গথিক হরর গোত্রের কাহিনি, যথা ব্রাম স্টোকার এর 'ড্রাকুলা'... এও আসলেই স্পেকুলেটিভ ফিকশন। এমনকী শেক্সপিয়ারের 'এ মিডসামার নাইটস ড্রিম'ও তাই। ইউটোপিয়া/ডিস্টোপিয়া, এই দুই ধরনই এখন আমাদের পাঠ বলয়ে উপস্থিত। সোহম গুহ যুগপৎ ইংরেজি ও বাংলাতে প্রচুর কল্পকাহিনি, কল্পবিজ্ঞানকাহিনি, হার্ড সায়েন্স নির্ভর কাহিনি ও স্পেকুফিক লিখে চলেছেন। তরুণ এই লেখকের নানা লেখাই সাড়া জাগানো। নিজস্ব বিশ্বনির্মাণে দক্ষ সোহমের এই বইতে পাচ্ছি প্রাগৈতিহাস, জীবাশ্ম, ভূতত্ত্বের পাশাপাশি একেবারে এই মুহূর্তের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষিত। ভারতীয় প্রেক্ষিতে এ কাজ আগে হয়নি, বলাই বাহুল্য। বইটি উৎসুক পাঠকের তথ্যক্ষুধা ও চিরন্তন পাঠকের গপ্পো শোনার খিদে দুইই মেটাবে, এ বিষয়ে আস্থা রাখাই যায়।"

—যশোধরা রায়চৌধুরী
সাহিত্যিক

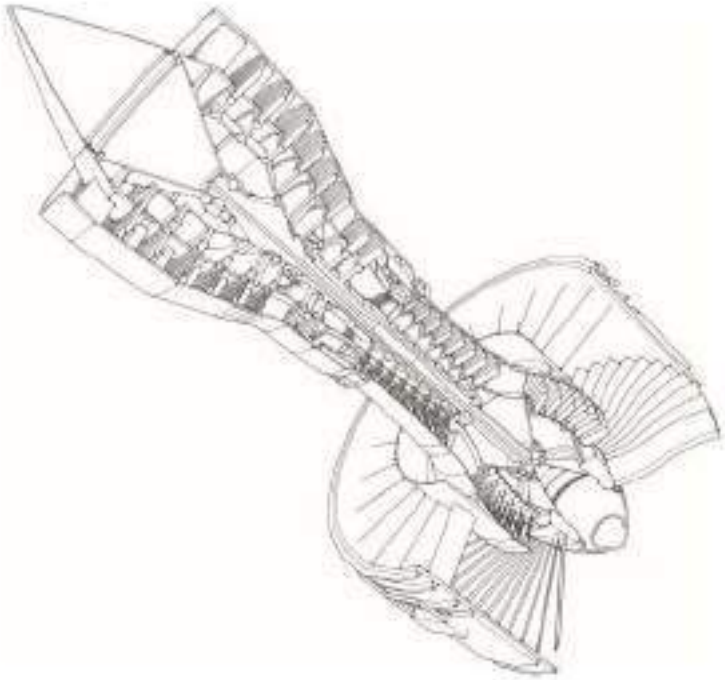

শূন্য

বেআইনি কয়লার খাদানে ধস নামায় বারো জনের মৃত্যু...

এক স্থানীয় খবরের কাগজের এক কোণে হয়তো ছোট্ট করে বেরোত খবরটা যদি-না সম্পাদককে বেশ কিছু টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করত একটা লোক। সম্পাদক তাই শূন্যস্থানটা একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। রোজ-দিনের খবরের ভিড়ে কে আর মনে রাখে এইসব খবর, তাও লোকসভা ভোটের আগে? এ কি শিল্পপতির ছেলের বিয়ে, না কোনো বহুচর্চিত অভিনেতার ব্রেকাপ যে মিডিয়া ছুটবে বাইটের লোভে? এসব পাতি খবর, কিছু মামুলি লোকের অপঘাত মৃত্যু। সাচ্চা জ্যোতিষী কেউ হলে তিনি কিন্তু লাফিয়ে উঠে বলতেন যে এ এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনা। না, শ্রমিকদের মৃত্যু দুঃখজনক হলেও তা এক ভূমিকা মাত্র। কিন্তু সেইদিন মানুষগুলো একটা পাঁচ বাই চারের সুড়ঙ্গে মাটি চাপা পড়ে দমবন্ধ হয়ে মারা না-গেলে হয়তো মানুষের ইতিহাসের প্রথম পাতাগুলোর কথা অজানাই থেকে যেত, যে পাতাদের সৃষ্টি আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষ *পার্গেটোরিয়াস*-এর সঙ্গে, তুষার যুগেরও প্রায় কয়েক কোটি বছর আগে।

কার্তিক থম মেরে বসেছিল তার চালাঘরে। কুপি জ্বলছে একমনে, তার পাশের বিছানাটা শূন্য। বিছানার ছেঁড়া চাদরটা কিছুটা অবিন্যস্ত। ঘরের ভেতর ঘ্রাণ নিলে এখনও কার্তিকের নাকে আসছে তার বাপের পোড়া বিড়ির গন্ধ। সব আছে। মানুষটাই নেই। সৎকারের জন্য দেহটা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

'এভাবে বসে থাকলে কেউ খাবার ধরিয়ে দেবে না তোর মুখে।' গলা শুনে কার্ত্তিক মুখ তুলে তাকাল। আয়ান দাঁড়িয়ে। তার ছোটোবেলার বন্ধু, বর্তমানে মালিক। গোঁজ হওয়া ঘাড়টাকে কেবল একটু এপাশ-ওপাশ নাড়াল সে। 'খিদে নেই।'

আয়ান কুপির আলো জ্বালিয়ে কার্তিকের ঘরটাকে একটু দেখল। সন্ধের আঁধার বাইরে নেমেছে। কুপির আলোয় আগোছালো পড়ে কার্তিকের ঘর। মন ভালো নেই আয়ানেরও। ছোট্ট জনপদ তাদের, অধিকাংশ মানুষই কয়লা বাদে আর কিছু জানে না। এই কয়লা মিশে গেছে তাদের বাতাসে, তাদের রক্তে, পর্দা ফেলে দিয়েছে তাদের ভবিষ্যতের সামনে। একটা ছোট্ট দলকে চালনা করত আয়ান। গ্রামের মধ্যে তারই পয়সা এবং যোগাযোগ একটু বেশি। কিন্তু আজকে হঠাৎই সে আর কার্তিক একই অন্ধকার ভবিষ্যৎ পথের পথিক। তারা বাদে সেই মজুরদলের সবাই আজকে ডুবে মরেছে এক পাতালগহ্বরে।

কার্তিকের মাথার পেছনে একটা কুলুঙ্গি, সেইখানে ওর বাপের কয়লার খাদানে পাওয়া বিভিন্ন জিনিস। আয়ান তার নীচে বসে একটা পাথর হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। অনেক চিন্তা তার মনে, শহর থেকে সাংবাদিকগুলো এখনও আসেনি, এলে ছেঁকে ধরবে তাকে, বেআইনি কয়লা খোদাই দলের মালিক হিসেবে। খবরটা ছড়িয়ে পড়লে তার রাজনৈতিক দাদারাও হয়তো তেমন সাহায্য করতে পারবে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উপর দিকে তাকাল আয়ান। কুলুঙ্গিতে চোখ পড়ল তার। একটা চিহ্ন জীবাশ্ম, আয়ানের বাবা খুঁজে পেয়েছিল ওই গহ্বরে কয়লা খননের সময়ে। তখন ভালো করে দেখেনি, বা দেখতেও চায়নি। কিন্তু এখন, এই আলোছায়ার মধ্যে ওই পাথরটা থেকে চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। কাছ থেকে দেখে তার মনে হচ্ছে জীবাশ্মটা স্বাভাবিক না।

মনে পড়ল একজনের কথা, যে হয়তো এই ব্যাপারটার কিছু সুরাহা করতে

পারবে, হয়তো ধামাচাপা দিতে পারবে এই ঘটনাটা দরকার পড়লে। মেয়েটার সঙ্গে সে ছোটোবেলায় মাঙ্গুরু শহরের এক স্কুলে পড়েছে। এখন মেয়েটা দিল্লিতে থাকে, সরকারের পাথর বিভাগে কাজ করে। ওর দাদা এখন এখানকার এক বড়ো নেতা—অনেকের মতো আয়ানেরও ঝুঁটি বাঁধা তার কাছে। সেই দাদাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবে? না, ফোনটা করতে গিয়েও করল না আয়ান। লোকটার কাছে বেআইনিভাবে কয়লা তোলার জন্য একটা মোটা টাকা সে ধার করেছে। রোজগারের পথ আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে জানে না কীভাবে এই টাকাগুলো ফেরত দেবে। প্রতিদিন চক্রবৃদ্ধি হারে সেই ধারের অঙ্ক বেড়েই চলেছে। দরকার না-পড়লে এখন তাই ওই দাদাকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে আয়ান। আর তা ছাড়া, কী একটা গণ্ডগোল বেঁধেছিল মেয়েটার সঙ্গে তার দাদার, পালিয়ে বেঁচেছিল মেয়েটা। পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটলে এখন তারই হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই, ফেসবুকে মেয়েটাকে খুঁজল আয়ান, মাথাটা ঘুলিয়ে ওঠার আগে। টাকার দরকার তার এখন। দরকার এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়া রাজনৈতিক সাহায্য ব্যতীত।

অঞ্জুমালা উবেরে বসে একমনে ফেসবুক ঘাঁটছিলেন। দিল্লির তীব্র দূষণ আর যানজট কাচ ভেদ করে তাঁকে স্পর্শ করছিল না। হাতের অলস স্পর্শ তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মোবাইলের স্ক্রিনে ভাসা ফেসবুকের ফিডগুলোকে। কত মানুষ পৃথিবীতে, কত তাদের ব্যক্ত করার ইচ্ছা নিজেদেরকে। কত তাদের লাইক এবং কমেন্ট পাওয়ার বুভুক্ষু খিদে। আর এর মধ্যেই তার মেটা মেসেঞ্জারে একটা পিং ঢুকল। হাই তুলে মেসেঞ্জার খুলল সে, তার গ্রামের একটা ছেলে মেসেজ করেছে। কিন্তু ছবিটা... হেলান দিয়ে বসেছিলেন এতক্ষণ অঞ্জুমালা, আপনা থেকেই শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল তাঁর। অঞ্জুমালা কিছুক্ষণ বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে। কোনো গ্রাম্য ঘরের এক কুলুঙ্গির ছবি। সেখানে রাখা অনেক পাথর। কাদাপাথর, মারবেল, গ্রানাইট, বেলে। আর তারই মাঝে শুয়ে ঘুমাচ্ছে একটা অবিশ্বাস্য ফসিল। মেসেঞ্জার বন্ধ করে তিনি দ্রুত ডায়াল করলেন তার বসকে। হৃদপিণ্ড উত্তেজনায় যেন তাঁর বুকে দুরমুশ পিটছে।

নিজের ঘরে বসে একমনে হাতের কাগজগুলো পড়ছিলেন এলেন. জি. ফাটার। দলিলটার উপরে ওভাল অফিসের চিহ্ন, সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে খরচা বাড়তে সরকার ফাটারের প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ অনুদান কমাবে তারই একটা নাতিদীর্ঘ প্রস্তাবনা। পড়তে পড়তে বোধহয় রাগে মাথায় রক্ত উঠে গেছিল ফাটারের, তাই প্রাইভেট সেলফোনটা বেজে উঠতে ধরে প্রায় চিৎকার করেই বললেন, 'কী?'

ওপাশ থেকে প্রমীলা সেক্রেটারি ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, 'স্যার, জিয়োলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ফোন করেছেন। আর্জেন্ট। ওঁকে আমি আপনার অফিসের লাইনে ট্র্যান্সফার করছি।'

বিরক্তি মোছার চেষ্টা করে আরেকটা ফোন তুলে তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার ডানিয়েশ?'

ওপাশ থেকে কেউ বললেন, 'ক্রিটেসাস যুগের বুলেটটার কথা মনে আছে?'

'কিছু জিনিস কখনও ভোলা সম্ভব না। পিল্‌টডাউন মানুষের মতো জালিয়াতি কিনা সেটা বুঝতেই আমার কয়েক বছর পেরিয়ে গেছিল। তারপর ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম সিন্দুকে। ভুলতে চেয়েছিলাম। পারিনি।'

'যদি বলি আমরা জালিয়াতি শিকার হইনি আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে, বিশ্বাস করবে?' একটু দম দিলেন দীনেশ। 'একটা বুটের ছাপ পেয়েছি ওই যুগের পাথরে। সম্ভবত তার, যে ওই গুলিটা ছুড়েছিল।'

ফাটার ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলেন তিনি তাঁর অফিসে বসে। তাঁর মাথার উপর আবার সেই গনগনে সূর্য, চোখের সামনে ভাসছে ছেচল্লিশ বছর আগের এক দিন এবং এক রুক্ষ ভূভাগ। 'কোথায়?'

'আমাদের তেলেঙ্গনা রাজ্যের এক গণ্ডগ্রামে। বলে লোকেশন বোঝাতে পারব না। আমি জিপিএস কো-অরডিনেট পাঠাচ্ছি।'

একসঙ্গে পড়াশুনো করেছেন দুজনে। তবুও বন্ধুর কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ফাটার। 'ইয়ার্কি করছ? বুটের ছাপ তোমার ওখানে, বুলেট আমার মহাদেশে। মাঝের সাগরগুলো পেরল কি করে?'

'সম্ভবত সে-এক দলের অংশ, এক *মানুষপ্রজাতি* যাদের উল্লেখ নেই পাথরের প্রাচীন ভাঁজেতে।' একটু দম নিলেন দীনেশ। 'সময় আমাদের সঙ্গে এক অদ্ভুত খেলা খেলছে, ফাটার। সেই খেলার শেষটা আমি এতদিনে দেখতে পাচ্ছি। আমি